গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১০
মার্চ ২০২২

নারীরা শক্তিস্বরূপিনী। বৈদিক সমাজে নারী ও পুরুষের ছিল সম-অধিকার। পরে বৃহত্তর ভারতের নারীদের অধিকার খর্ব হতে হতে, এক সময়ে তাঁরা ‘অসূর্যম্পশ্যা’ হয়ে পড়েন। তবে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা সমাজের এই কদর্য বেড়াজাল ছিন্ন করছেন, এবং গোটা বিশ্বে স্বপ্রতিভার দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষমও হচ্ছেন। তবু আজও বহু স্থানে নারীরা অকথ্যভাবে নিপীড়িত। আমরা কি পারিনা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে?

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, নাহার আলম, শর্মিলা ভট্টাচার্য, অনাবিল তসনিম, রানা জামান, সুজন ভট্টাচার্য, দেবী প্রসাদ চৌধুরী, এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

অতিমারীর বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর আক্রমণ স্তিমিত হতে না হতেই, বেজে উঠেছে যুদ্ধের শিহরণি দামামা । যখন প্রকৃতির কোপ কেড়ে নিচ্ছিল অসংখ্য প্রাণ, সবাই তখন একজোট হয়ে চেষ্টা করেছেন মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে। আমরা মানুষরাই গিরগিটির মতো ক্ষণিকের মধ্যে নিজেদের মানসিকতার রঙ পাল্টে ফেলতে দ্বিধা বোধ করি না। এইতো কদিন আগেই, মানুষই রক্ষাকর্তা বা ত্রাণকর্তা রূপে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বের মানব সম্প্রদায়কে করোনার থেকে বাঁচানোর জন্য। আবার এখন ভয়াল রূপে সংহার মূর্তি ধারণ করে সজীব প্রাণ কেড়ে নিতেও পিছপা হচ্ছে না কিছু মানুষ।

আসলে ক্ষমতার লোভ মানুষের শুভ বুদ্ধিকে গ্রাস করে ফেলে খুব সহজেই। আমরা যতই বলি 'সকলের তরে সকলে আমরা...' তা নিছক স্ত্রোত বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। বর্তমানে অতিমারী আর যুদ্ধের ধাক্কা আমাদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকেও বেশ বিপর্যস্ত করে তুলেছে। পরিস্থিতি ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে বা যাবে, তা এই মুহূর্তে আমরা কেউই সঠিক ভাবে অনুমান করতে পারছি না।

তাই এখন অকারণে কোন দ্রব্যের অপচয় না করাই শ্রেয়। তবে সব খারাপের শেষেই কিছু ভালোও হয়। তাই আশা রাখি শীঘ্রই ফিরে আসবে শান্তির জীবন। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।

আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com

২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।

৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।

৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

গুঞ্জনের প্রকাশিত সংখ্যা ২০২২

জানুয়ারি ২০২২: https://online.fliphtml5.com/osgiu/ialo/

ফেব্রুয়ারী ২০২২: https://online.fliphtml5.com/osgiu/eusb/

পাঠকের দরবার

বিজ্ঞানের যুগে আমরা এখন ‘মোবাইলে’ (মুঠোফোন) সারা বিশ্বের বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ২০-৩০ বছর পেছনে তাকালে আমরা এতো দ্রুত এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে পৌঁছে যাব – স্বপ্নাতীত; কিন্তু বাস্তবে ঘটে গেছে। মাসিক ই-পত্রিকা ‘গুঞ্জন’ এই সুযোগ পাঠকদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে... আমাদের মতো যারা লেখালেখির জগৎ-এ আছি তাদের পক্ষে এ যেন আশীর্বাদ! সম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে আমার তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৮ জানুয়ারী ২০২২ এ প্রকাশিত লেখাগুলি পড়ে আমার নিজস্ব মতামত এখানে উল্লেখ করছিঃ–

ডঃ মালা মুখার্জীর ‘আকালী’: এই ঐতিহাসিক গল্পের অন্তিম পর্বটি পাঠ করে আমি বেশি তৃপ্তি পেয়েছি। একটা ঐতিহাসিক কাহিনীর কল্পনাই শুধু নয়, এর জন্য ভাষাও আলাদা, দ্রুত গতিতে শেষ করতে হয়। এই বিষয়ে লেখিকা যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছেন। যদিও পূর্বের ঘটনা বিন্যাস পাঠ করার সুযোগ হয়নি, তথাপি বলবো, লেখিকা যথেষ্ট অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

তবে আমার দৃষ্টিতে এটা এমনও হতে পারতঃ-

... ১৮০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। ভারতবর্ষে তখন

পাঠকের দরবার

ইংরেজদের রাজত্ব বিস্তারের সময়কাল। ইংরেজদের দাপট এবং সৈন্যদের সুশৃঙ্খল লড়াই-এর জেড়ে ১৭৫৭ সালে বাংলার রাজধানী পলাশী জয় করে নেন ইংরেজরা (সিরাজউদ্দৌলার রাজত্ব)। বাংলার নবাবকে পরাজিত করে ক্রমশ ইংরেজরা কলিকাতাতে পৌঁছে যায়। সে আরেক ইতিহাস! ...এরপর লেখিকা ডঃ মালা মুখার্জীর কাহিনীর বিস্তার ঘটলে অবশ্যই নিখুঁত একটা ঐতিহাসিক কাহিনী হতো। এভাবে পরামর্শ দেবার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি নিজে গল্প-উপন্যাস-কাব্য ও কবিতা নিয়ে অনেক গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি। কাহিনী নির্বাচনের উপর গল্পের গতি ও ভাষা প্রয়োগ হয়। একটা প্রেমের দ্বান্দ্বিক দিক প্রয়োগে গল্পের গতি যতটা সম্ভব শ্লথ বা ধীর হবে। আবার দ্বন্দ্ব ছাড়া গল্পের ডিটেলের ব্যবহারে সাধারণ গতি থাকবে। গল্প ছোট হবে এমন কথা বলা যায় না, তবে গল্পে গল্পত্ব থাকতেই হবে। সে ছোট হউক অথবা বড়। জীবনের খণ্ডতার ব্যবহার থাকবে গল্পে, পূর্ণতার নয়। যাক, আমার মতো ক্ষুদ্র পাঠকের মতামত ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে অবশ্যই জানাবো।

প্রসাদ

আলিপুরদুয়ার (প.ব.), ভারত ■

‘গুঞ্জন’ সম্পর্কে আমরা পাঠকদের মতামত জানতে চাই, আপনার ছবিসহ আমাদের ‘ই-মেল’-এ সম-আলোচনা পাঠান।

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ প্রতিবিম্ব...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আপনি কি ছবি তুলতে ভালবাসেন?

আমাদের পাঠকরা আপনার ক্যামেরায় বন্দী করা সুন্দর মুহূর্তগুলো দেখতে খুবই উৎসুক, তাই আপনার কাছে আমাদের আবেদন – আপনার তোলা কিছু সুন্দর ছবি আমাদের ই-মেল-এ পাঠিয়ে দিন।
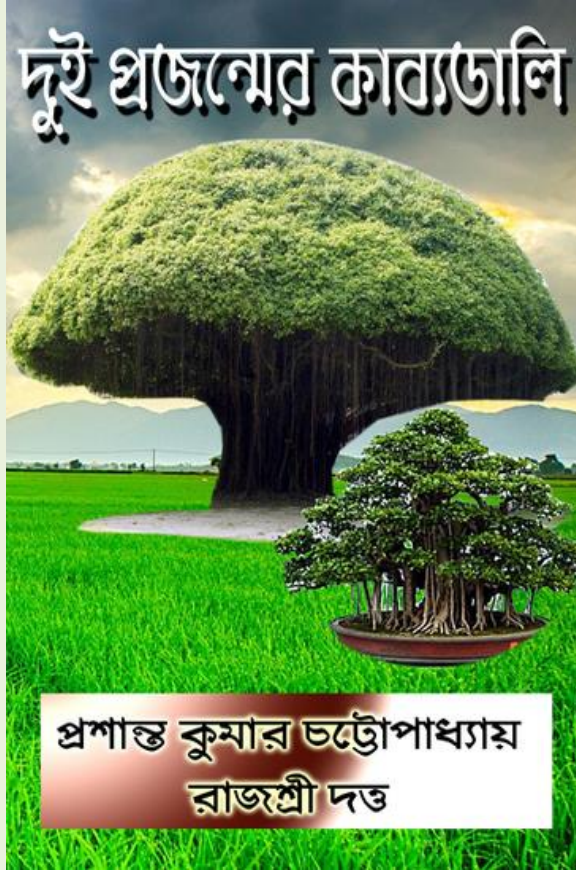
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com
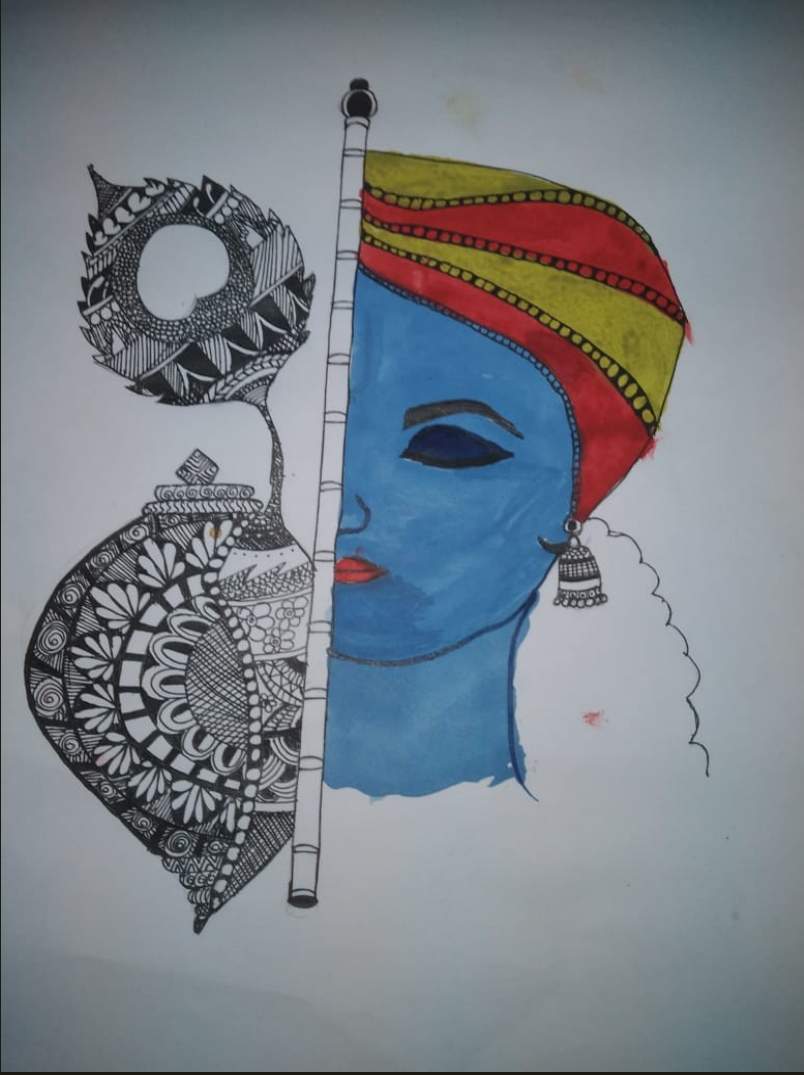
হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ মাণ্ডালা আর্ট...

শিল্পীঃ সঞ্জনা দাস **বয়সঃ** ১৩ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

আমরা ছোটদের আঁকা ভাল ছবি চাই। অবশ্যই পাঠানো ছবি মনোনীত হলে তা ‘গুঞ্জন’-এ প্রকাশিত হবে, তিন মাসের মধ্যে। কোন প্রাপ্তিস্বীকার করা সম্ভব নয়। শিল্পীর নাম ও বয়স চাই। আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ দোলের দিনে...

শিল্পীঃ রুদ্র দাস **বয়সঃ** ১১ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

আমরা ছোটদের আঁকা ভাল ছবি চাই। অবশ্যই পাঠানো ছবি মনোনীত হলে তা ‘গুঞ্জন’-এ প্রকাশিত হবে, তিন মাসের মধ্যে। প্রাপ্ত ছবিগুলির জন্য আলাদা করে কোন প্রাপ্তিস্বীকার করা সম্ভব নয়। শিল্পীর নাম ও বয়স চাই।

আমাদের ই-মেলঃ

contactpandulipi@gmail.com

আমি কৃষ্ণকলি নই

অনাবিল তসনিম (বাংলাদেশ)

আমরা তখন ইন্টারমিডিয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। সবে আমরা ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছি।

একদিন ম্যাডাম ক্লাস নিচ্ছিলেন, এমন সময় একটা মেয়ে এসে বলল, "মে আই কাম ইন, ম্যাম?" ম্যাডাম বললেন, "ইয়েস, কাম ইন। তুমি কে? তোমাকে তো আগে এই কলেজে কখনো দেখিনি।"

"ম্যাডাম, আমি সেকেন্ড ইয়ারে এই কলেজে ভর্তি হয়েছি। আগে আমি ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে পড়তাম। বাবার বদলিজনিত কারণে সেখান থেকে টি.সি. নিয়ে এই কলেজে এসেছি।"

"ও আচ্ছা। যাও, টেক ইওর সিট।"

প্রথম দিনই মেয়েটাকে দেখে আমাদের সব বান্ধবীদের মধ্যে রীতিমতো হাসাহাসির রোল পড়ে গেল। এর পেছনে প্রধান কারণ হল – মেয়েটার রূপ। মেয়েটার চেহারা শ্যামবর্ণা। শুধু শ্যামবর্ণা বললে ভুল হবে, যেরকম চেহারা হলে মানুষ একজনকে শ্যামলা বলতে পারে, মেয়েটার

শিক্ষা

চেহারা ছিল তার চেয়েও কালো। তবে মেয়েটার হাসি ছিল অসম্ভব মায়াবী। তার চোখদুটো ছিলো অনেকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা' গল্পের নায়িকা সুভার মতো। বড় বড় চোখ। মেয়েটার চালচলন, কথাবার্তা ছিলো অত্যন্ত সাদামাটা।

ওকে প্রথম দিন ক্লাসে দেখে সবাই ওর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিল। সেই তাকানোর মধ্যে ছিল তুচ্ছ জ্ঞান করা। মেয়েটাকে দেখে আমার পাশে বসে থাকা শিশির আমাকে ধাক্কা দিয়ে খানিকটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, "দোস্ত, এই মেয়েটার চেহারাটা দেখেছিস? কয়লাও তো এরকম কালো না। হা হা হা..."

"এতে এতো হাসির কী আছে?"

"হাসবো না? দ্যাখ না, ওর চেহারাটা দেখলেই গা ঘিনঘিন করে। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!"

আমি খানিকটা রাগী গলায় বললাম, "তোর পছন্দ হয় না তো ওর দিকে না তাকালেই পারিস। এভাবে বলার কী আছে? সে-ও তো তোর আমার মতো একজন মানুষ।"

"দ্যাখ রিবা, এসব জ্ঞান আমাকে দিবি না। অসহ্য লাগে আমার।"

মেয়েটি ক্লাসে এসে লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসল। লাস্ট বেঞ্চটিতে আরও দুজন মেয়ে ছিল, কিন্তু নতুন এই কালো মেয়েটাকে সেখানে বসতে দেখে তারা দুজন বেঞ্চ থেকে

উঠে অন্য বেঞ্চে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর কবিতা আপা ক্লাস শেষ করে চলে গেলেন। আমি বেঞ্চ থেকে উঠে মেয়েটার কাছে গিয়ে বললাম, "তোমার নাম কী?"

"জি আমার নাম চেষ্টা।"

"বাহ! ভারি আশ্চর্য নাম তো তোমার! পূর্বে এমন নাম শুনেছি বলে মনে পড়ে না।"

"থ্যাংকস। আপনার নাম কী?"

"আমি অনিমা ইসলাম রিবা। তবে সবাই আমাকে রূপা বলেই ডাকে। তুমিও আজ থেকে আমাকে রূপা বলে ডাকবে। বুঝতে পারছো? এবং 'আপনি' নয়, 'তুমি'। ওকে?"

চেষ্টা হ্যাঁ-সূচক সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "আজ থেকে আমরা বন্ধু। তুমি কি আমার বন্ধু হবে?"

হতভম্ব দৃষ্টিতে চেষ্টা তাকিয়ে আছে। যেখানে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, সেখানে ক্লাসের এরকম সুন্দরী একটা মেয়ে নিজে থেকে তার সাথে কেন বন্ধুত্ব করতে চাইছে! এটার কারণটা সে হয়তো বুঝতে পারছে না। আমি আবারও বললাম, "কী হলো? কথা কেন বলছো না? তুমি কি আমাকে তোমার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না?"

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। সম্ভবত তার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি।

শিক্ষা

চার মাস পরের কথা...

ক্যাম্পাসে সবারই নিজস্ব নাম ছাড়াও আলাদা একটা নাম থাকে। ক্যাম্পাসে এবং বন্ধু মহলে সে সেই নামেই পরিচিত হয়। বন্ধুমহলে আমার নাম ছিল রূপা। চেষ্টা নতুন ভর্তি হবার কিছুদিনের মধ্যেই সে ক্যাম্পাসে 'কৃষ্ণকলি' নামে পরিচিত হয়ে যায়। নামটি যে স্রেফ তাকে অপমান করার জন্যেই দেওয়া, সেটি বুঝতে কষ্ট হয় না চেষ্টার। চেষ্টা জানে সে রাবীন্দ্রিক কাব্যের নায়িকা 'কৃষ্ণকলি'র কোনোকিছুই ধারণ করে না; কেবল চোখ দুটো ছাড়া। তার নেই লম্বা চুল, নেই কৃষ্ণকলির মতো লাবণ্যও। চেষ্টা রুক্ষদেহী। তার ভেতরে-বাহিরে আছে ঝড়ের আভাস। বন্ধুদের রসিকতা, অপমান মেনে নেয় মনে মনে। ক্লাস, ক্যাম্পাসে এমনকি স্যার/ম্যাডামদের কারোরই সহসা দৃষ্টি আর্কষণ করতে পারে না সে। এই অবজ্ঞাটা যেন আট দশটা স্বাভাবিক ঘটনার মতোই লাগে আজকাল তার কাছে। সবাই ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে; বিদ্রুপ করে। চেষ্টা কোনোদিন প্রতিবাদ করেনি; সে সবসময় মুখ বুঁজে সব সহ্য করে। ওর সহ্যশক্তি দেখে আমি মাঝে মধ্যে অবাক হয়ে যাই। আমি ওর দৃঢ়তার কাছে নত হয়ে যাই। ভালো লাগে, ভীষণ ভালো লাগে ওকে।

মেয়েটার জন্য আমার মনে অসম্ভব মায়া জন্মায়। আমি

সবসময় ওর সাথে থাকতাম। ক্যাম্পাসে আমি ছাড়া ওর আর কোনো বান্ধবী ছিল না। এমনকি আমি ওর সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করেছি এই কারণে আমার অন্য বান্ধবীরা আমাকে নিয়েও মাঝে মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করতো; বিদ্রুপ করত। আমি সে সবে মোটেই পাত্তা দিতাম না। লোকে অনেক কিছু বলে, লোকের কথায় কান দেওয়া আমার স্বভাবে নেই।

দেখতে দেখতে আমাদের টেস্ট পরীক্ষা চলে এল। যেদিন টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট দিল, সেদিন আমরা সবাই হতবাক হলাম। কলেজের সবাইকে অবাক করে দিয়ে টেস্ট পরীক্ষায় চেষ্টা সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম হল। আমি হলাম তৃতীয়। চেষ্টা সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় সবার মতো অবাক হবার পাশাপাশি আমি মনে মনে খুশিও হয়েছিলাম। এরপর ইন্টারমিডিয়েটের বোর্ড পরীক্ষাতেও চেষ্টা সবাইকে ছাড়িয়ে গেল।

এরপর আমি আর চেষ্টা দুজনেই একসাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। বরাবরের মতো সেখানেও তাকে কারণে-অকারণে সবসময় অপমানিত হতে হত।

দুই বছর পর...

আজ মাস্টার্সের রেজাল্ট বেরিয়েছে। সে মাস্টার্সে ফার্স্ট হল। এমনকি তার নম্বর ছিলো বিগত দশ বছরের থেকে

সর্বোচ্চ। সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে রেকর্ড সংখ্যক নম্বর নিয়ে পাস করে।

"মাস্টার্সে চেষ্টা কীভাবে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পাস করলো" — এই আলোচনায় আমরা যখন ব্যস্ত, তখন চেষ্টা সবার সামনে দাঁড়িয়ে ক্লাসের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আজ আমি তোমাদের কিছু কথা বলতে চাই।"

চেষ্টার কথা শুনে আমরা সবাই একটু নড়েচড়ে বসলাম। সে কী বলতে চায় তা শোনার জন্য আমরা সবাই তার দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সে বলতে শুরু করল, "আমি কালো বলে তোমরা সবাই আমাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করো, সেটা আমি জানি। কিন্তু এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কেন জানো? কারণ, আমি জানি যে শুধু আমি না, আমার মতো প্রতিটি কালো মেয়েকেই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এরকম পরিস্থিতির শিকার হতে হয়।

জন্মের পর থেকেই একটা কালো মেয়ের প্রতি অবহেলা শুরু হয়। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন বান্ধবীদের সাথে খেলার জন্য ছুটে যেতাম খেলার মাঠে। কিন্তু কেউ আমায় খেলায় নিত না। কারণ একটাই; আমি কালো। এরপর আমি যখন আস্তে আস্তে বড় হতে থাকলাম তখন সমাজ, বান্ধবী, স্কুলের সহপাঠীদের অবহেলা দিন দিন বেড়েই চলল। একদিন বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম — 'বাবা, আমি কি

দেখতে এতোটাই খারাপ? সবাই আমাকে এতো অবহেলা কেন করে? আল্লাহ কি আমাকে সুন্দর চেহারা দিয়ে সৃষ্টি করতে পারতেন না? তিনি কি পারতেন না আমাকে অন্য মেয়েদের মতো সুন্দরী করে সৃষ্টি করতে? উনি তো অবশ্যই পারতেন। তাহলে কেন আমাকে উনি এরকম কালো, কুৎসিত করে সৃষ্টি করলেন?'

তখন বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন— "দ্যাখ মা, আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। তুই আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ আর নিজের ক্যারিয়ারে মনোযোগ দে। মানুষের কথায় তোর কান দেওয়ার কিছু নেই। আমরা সমাজে বাস করি, আমাদের সমাজে নানারকম মানুষ আছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও এক না; প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। নীচ স্বভাবের কিছু মানুষ কালো মানুষদের দেখে অবজ্ঞা করে; অবহেলা করে। কিন্তু আমরা সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি।"

বাবা আরও বলেছিলেন — "সবসময় মনে রাখবি মা, যারা মনে করে কালো হয়ে জন্মগ্রহণ করাটা একটা অভিশাপ, তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খ। জয় আসবেই তোর; কারণ তোর নাম 'চেষ্টা'। যার নিরন্তর চেষ্টা থাকে সে একদিন তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবেই। গো এহেড এন্ড স্ন্যাচ ইওর এইম।"

"আমিও হয়তো পৌঁছেছি। হয়তো আমার 'চেষ্টা'

নামটিকেও সার্থক করতে পেরেছি। বাবার সেদিনের বলা কথাগুলো আমার আজও মনে আছে। সেদিনের পর থেকে নিজের মনকে শক্ত করে নিয়েছিলাম। হ্যাঁ বন্ধুরা, গায়ের রঙ দিয়ে কাউকে কখনো বিচার করতে যেও না। আমি সবার কাছে হাসির পাত্রী ছিলাম; আর কেউ না হয় — সেটাই চাই মনেপ্রাণে। আরেকটা কথা — আমি 'কৃষ্ণকলি নই', আমি চেষ্টা।"

কথা বলতে বলতেই গলা ধরে আসে চেষ্টার। সে চোখ মুছে ধীরে ধীরে নেমে আসে ক্লাসরুমের রস্ট্রাম থেকে। তারপর ক্লাসরুম ত্যাগ করে নিঃশব্দে। আমরা কি কেউ আনমনা হয়েছিলাম তখন?

হয়তো-বা হয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরই ঘোর কাটে। চেষ্টা চলে গেছে। অনেকের চোখের কোণে পানি। কারো গণ্ড বেয়ে জল পড়ছে। আমারও কি ভিজেছিলো চোখ জোড়া সেদিন? না, কিছুই মনে পড়ছে না। কেবল মনে পড়ছে চেষ্টার বিদায় মুহূর্তটা। সেই কথাটা — 'আমি কৃষ্ণকলি নই, আমি চেষ্টা...'

ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে সমস্ত ক্লাসরুম গমগম করে ওঠে। বিষন্ন ভারী হাওয়ায় দূষিত হয়ে পড়া ক্লাসরুম থেকে কীভাবে সেদিন বের হয়ে পড়েছিলাম — আজ আর মনে পড়ে না। ■

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: এপ্রিল ২০২২ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই মার্চ, ২০২২

অনুবাদহীন এক গল্পশরীর

নাহার আলম

কীর্তিনাশা নদীর মতো আমার আর বয়ে চলা হলো না।
অবিশ্বাসের পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণে পা দু'খানা অচল প্রায় আজ।
কারো আজন্ম প্রেমিকা হবার ইচ্ছেটা বুঝি গল্প হয়ে উঠল না ঠিকই এবার!
বুঝে নিলাম...কলমের কালি ফুরোবার আগেই তা লিখেও রাখলাম...
একদিন যার কথা মনে করে করে ঘনঘোর বরিষণেও ফাগুনের আগুনরঙে সেজেছিলাম...
সাঁঝবেলায় ফেরার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে বেহুদা কেঁদেছিলাম।
অথচ, পেরিয়ে এসেছি বটে সেইসব কালবেলার প্যাঁচানো সর্পিল অসুখ
অসুখ সময় ও সোহাগের অনাদুরে বিয়োগযোগ!
তবুও থেকে গ্যাছে রেশ...আজও অনিমেষ...একটুও ম্লান না হয়ে,
জ্বলজ্বলে দহনের তাপরেখা বরাবর জ্বলছে অনিঃশেষ...

কথন

যুদ্ধের সহিংস জোয়ার সমাগমেও কোকিলের কণ্ঠ চুরি করে সেধেছিলাম সুর গোপনেই-অবলীলায়...
অনুবাদহীনতায় আজও সেইসব ইচ্ছেরা ঝুলছে অকৃতজ্ঞ মৌনসন্ধ্যার অন্ধকারে অবিরাম বারংবার...

চেয়েছিলাম আমি,
অন্ততপক্ষে একটিবার নিবিড় প্রেমিকা হবার স্বাদ নিতে।
হলো না! শেষ অবধি ত্বরিতকর্মা এক চতুর ভ্রষ্টা প্রতিপক্ষ
নিপাটে সাবড়ে নিলো প্রস্তুতির প্রাক্কালের
সকল সফল আয়োজন আমার!

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের তরল গরলে এভাবেই
গল্পটা মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে নিজেও থেমে গেছে
উপসংহারের অভিকর্ষীয় মমতায়, রাশিরেখা ছাড়িয়ে...
একটি সুপঠিত গল্পশরীরকে নির্মমভাবে মাড়িয়ে।। ■

'গুঞ্জন'-এর ২০২২-এর আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

এপ্রিল – সংস্কৃতি সংখ্যা

মে – শ্রমিক দিবস সংখ্যা

জুন – বর্ষা বরণ সংখ্যা

জুলাই – রহস্য, রোমাঞ্চ, কল্পকাহিনী সংখ্যা

*বিশেষ কারণে এই সুচী পরে পরিবর্তিত হতে পারে...

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ষষ্ঠ পর্যায় (১)

ডাঃ অমিত চৌধুরী

আবার গরমে যাত্রা। গত বছর গরমে পরিক্রমার সময়কার অনেক কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু অশোক দাসজী আর কাকাজীর ইচ্ছা এবং নর্মদা মায়ের উপর প্রবল আকর্ষণ সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

২১শে এপ্রিল ২০১৭ হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে বসলাম। দু'বার ট্রেন বদল করে দু'রাত্রি পর ভোর চারটের সময় এলাম ইটাশ্রী। একটু অপেক্ষা করে স্টেশনের বাইরে আসতেই এক পাঞ্জাবী অটো ড্রাইভার, ২৫০ টাকার বিনিময়ে বাইশ কিলোমিটার দূরে কোকসারে আমাদের পৌছে দিতে রাজী হয়ে গেল। এই কোকসারেই আমরা আগেকার পরিক্রমা সমাপ্ত করে ছিলাম।

নর্মদার কোলে এই জায়গাটি অতি মনোরম। গৌরীশঙ্করজীর অখণ্ড ধুনিতে দিব্যানন্দজীকে যজ্ঞ করতে দেখলাম। আলাপ হলো অতি প্রবীন সাধু গনেশ গিরি মহারাজের সাথে। আগেরবার ওনাকে দেখিনি। ওনার দু'চোখে ছানি পড়েছে। এখনি অপারেশন করার দরকার। সর্দির চাপও প্রবল। খুবই অসুস্থ লাগল। কাছে

যেতেই, ‘কোন হ্যায়’ বলে চিৎকার করে উঠলেন। বুঝলাম উনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। বললাম ‘আমরা পরিক্রমাবাসী।’ উনি বসতে বললেন। ওনার শরীরের খবর নিলাম। কিন্তু উনি নির্বিকার।

আমি বললাম, “আপনি তো সন্ন্যাসী মা নর্মদার কোলেই বসে আছেন। মায়ের কাছে আবদার করছেন না কেন আপনাকে সুস্থ করে দেবার জন্য?”

উনি চিৎকার করে উঠলেন, “কিঁউ মাঈ অন্ধা হ্যায় কেয়া?” বুঝলাম ওনার শারীরিক কষ্টের জন্য উনি অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন।

“আমি কি আপনার কোনো অসুবিধা করছি?” উনি বললেন, “না,না তুমি বসো এখানে।”

“আপনি তো সন্ন্যাসী, সারাজীবন তো মায়ের কাছেই আছেন মায়ের কথা ভাবছেন তাহলে এতো কষ্ট পাচ্ছেন কেন?”

উনি বললেন, “বাংলার রামকিষান শেষ জীবনে কি কষ্ট পেয়েছিলেন ভুলে গেলে? উনি কি মায়ের কোলে ছিলেন না?”

ঠাকুরের কথাই যখন উঠল তখন ওনাকে প্রশ্ন করলাম, “আচ্ছা মহারাজ, এক পরিক্রমাকারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে খুব নোংরা ভাষায় আক্রমণ করেছেন। আপনি কি জানেন?”

উনি বললেন, “না। আমি জানি না, জানতেও চাই না। তবে জেনে রাখো, যে আক্রমণ করেছে সে রামকেও

বোঝেনি আর কৃষ্ণকেও বোঝেনি। পাওয়া তো দূরের কথা।"

আমি বললাম, "উনি তন্ত্র, শাস্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রকে খুব তাচ্ছিল্য করেছেন।"

উনি বললেন, "সব শাস্ত্রেই জীব আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের কথা বলা আছে। এটা যে বোঝেনি দায় তার শাস্ত্রের নয়।"

আচ্ছা মহারাজ, "কেউ কেউ বলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আবার জন্ম নিয়েছেন সেটা কি সত্যি?"

খুব শান্ত এবং আস্তে আস্তে তিনি বললেন, "রামকিষান আর ঠাকুরাইন দ্বিতীয়বার জন্ম নেননি এবং নেবেনও না। তাই বেকার বাত মত্ বোলো।"

আমি বললাম, "আচ্ছা আপনি যে এই শারীরিক কষ্ট পাচ্ছেন তার ব্যাপারটা কি হল?"

উনি খুব ধীরে ধীরে বললেন, "এটা পূর্ব জন্মের কর্মফল বা প্রারব্ধ ক্ষয়। এটা সবাইকেই করতে হয়।"

আমি বললাম, "পূর্ব জন্ম পরজন্ম তো অনেকে মানেই না।"

উনি উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "কারো মানা না মানাতে কিছু এসে যায় না। পূর্বজন্ম বা পরজন্ম অব্যশই আছে। ভারতীয় মুনিরা যে কথা বলে গেছেন সেগুলো মিথ্যে বলে মনে করো?" উনি একটু হাঁফাচ্ছেন। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তোমাদের এই এক দোষ। একটু জেনেই মনে করো অনেক জেনে গেছি।"

হাতে সময় খুব কম তাই কথা না বাড়িয়ে ওনাকে প্রণাম

করে পরিক্রমা সফল হওয়ার প্রার্থনা জানালাম। উনি আশীর্বাদ করে বললেন, "এগিয়ে যাও মা তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।"

"সুদূরের পথে চলেছি একাকী
আপন মনে
জানি নাকো দেখা পাব তব,
কোন সে ক্ষণে।
এ জীবনে মাগো দেখা হল নাকো
দেখা দিও মোর মরণে।"

"নর্মদে হর"

...ক্রমশ ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

ক্রিকেটের রঙ্গমঞ্চ

সুজন ভট্টাচার্য

বিষাদ এবং উত্তেজনায় টানটান ক্রিকেটের রঙ্গমঞ্চ —

যতই ভাবি এবার ক্রিকেট নয় অন্য কোনো খেলা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব, ততই যেন ক্রিকেটের ভূত ঘাড়ে চেপে বসে। এবার খেলার রাজা কিংবা "স্বদেশে পূজ্যতে" খেলাটা নিয়ে না লিখলেই নয়। কারণ অনেকগুলো —

সাম্প্রতিক ক্রিকেটের সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্রের কিংবদন্তী খেলোয়াড়ের ক্রীড়াপ্রেমীদের স্তব্ধ ও বিষাদে আচ্ছন্ন করে এই রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরবিদায়; ঠিক বিপরীত মেরুর অর্থাৎ নিরেট "লো প্রোফাইল" কিন্তু যথেষ্ট প্রতিভাবান বাংলার ক্রিকেটারকে ঘিরে একেবারে "বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো" অপ্রত্যাশিত বিতর্ক; মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে পরম্পরাগতভাবে হারিয়ে ভারতের বিজয়... ইত্যাদি মিলিয়ে খেলার আসরে মেতে ওঠার উপচে পড়া খোরাক।

ক্রিকেটের বর্ণময় জাদুকরকে শেষ সেলাম —

প্রথমেই সেই বর্ণময় চরিত্রের কিংবদন্তীকে স্মরণ করে তাঁকে যথাযথ সম্মান না দেখালে শুধু গুরুতর অন্যায়ই হবে না, ক্রিকেট নামক খেলা এবং তার ইতিহাসকে গৌণ

করা হবে। অস্টেলিয়ার এই খেলোয়াড়কে নতুন করে চেনানোর কিছু না থাকলেও তার বিস্ময়কর প্রতিভার নজিরবিহীন স্মৃতিগুলোকে নতুন করে আরেকবার উপভোগ করে নিতে হবে।

অস্ট্রেলীয় লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন কার্যত ছিলেন লাল বল হাতে এক জাদুকর। তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর অসামান্য স্পিন-শিল্পে ব্যাটসমানদেরকে সম্মোহিত করে অনায়াসে তাঁদের উইকেট নিজের ঝোলায় পুরে নিতে পারতেন।

ওনার "বল অফ দি সেঞ্চুরি" অথবা "ডেলিভারি অফ দ্য সেঞ্চুরি," যা দিয়ে উনি স্পিন খেলায় দক্ষ এবং অভ্যস্ত খ্যাতনামা ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসমান মাইক গেটিংকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ঠিক কিভাবে বোকা বানিয়ে তাঁর উইকেটটি নিয়েছিলেন, তা কার অজানা? অল্প সময়ের ব্যবধানে আবার এজবাস্টনের ময়দানে গ্রাহাম গুচকে "রাউন্ড দ্য লেগ" বা পায়ের পেছনে বোল্ড করা। বস্তুতঃ ওয়ার্নের এরকম কল্পনার অতীত বল করার বহু নজির আছে, যার তালিকা উল্লেখ করার পর্যাপ্ত সুযোগ বা পরিসর এটা নয়। স্পিনের এই বিস্ময়কর জাদুকরকে সব ক্রীড়াপ্রেমীদের তরফ থেকে শেষবারের জন্য কুর্নিশ!

বিনম্রে, নীরবে অবদান রেখে এটাই কি তাঁর প্রাপ্য ছিল?

এবারে আসি বাংলার প্রতিভাবান ক্রিকেটার যাকে সদ্য-প্রাক্তন দলনেতা বিরাট কোহলি এবং সদ্য-প্রাক্তন কোচ রবি

শাস্ত্রী উভয়েই একবাক্যে বিশ্ব ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ উইকেট রক্ষক বলে অভিহিত করেছিলেন। এঁরা ছাড়াও দুনিয়ার তাবড় তাবড় খেলোয়াড় এবং ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা এই একই মত পোষণ করেছেন।

ঋদ্ধিমান সাহা বরাবরই অন্তর্মুখী এবং বিনয়ী ক্রিকেটার তথা মানুষ হিসাবে সুপরিচিত। এহেন মানুষটির সঙ্গে এমন কি হলো যে উনি হঠাৎ-ই ক্রিকেট জীবনের প্রাক্কালে এসে এভাবে বিতর্কে জড়িয়ে গেলেন? ইংরাজি ভাষায় বললে বলতে হয় "অল ইজ নট ওয়েল।"

যিনি ধনির মতো এক উইকেট রক্ষকের ছায়া থেকে বেরোবার কোনো সুযোগই পাননি, অথচ জাতীয় দলের হয়ে দেশের জন্য উইকেটের পেছনে ওনার সেরাটা দিয়ে গেছেন ও ব্যাট হাতে অনেক লড়াকু ইনিংস খেলে গেছেন, এবং নিরন্তর উৎকর্ষমানের প্রদর্শন ও অবদান রেখে গেছেন, তাঁর এতো বছরের অক্লান্ত সেবার বিনিময়ে তিনি কি সঠিক মর্যাদা কিংবা ব্যবহার পেয়েছেন? উত্তরে একেবারে সহজভাবে বলতে হয় "না।"

এটা ঠিক যে ঋদ্ধিমানের পরে উঠে আসা যুবক ঋষভ পন্থের ব্যাট হাতে দানবিক প্রতিভাটাই ঋদ্ধির নেহাত দুর্ভাগ্য বা কাল – যা একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কারুর দ্বারা ঠেকানো সম্ভবপর নয়। যে বিষয়টাকে ইংরেজি বললে বলতে হয় ঋদ্ধির জন্য "দ্য লাস্ট নেইল ইন দ্য কফিন।"

কিন্তু সর্বোপরি নির্বাচকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য চেতন শর্মা এবং বর্তমান হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় এই গোটা ব্যাপারটাকে যেভাবে পরিচালনা করে দেখালেন সেটা ঋদ্ধিমানের মোটেই প্রাপ্য ছিল না।

অন্যদিকে, এক জাতীয় স্তরে স্বনামধন্য ক্রীড়া সাংবাদিক ঋদ্ধিমানের সঙ্গে যে আচরণটা করলেন তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য তো নয়ই বটে। বরং এটা শালীনতাবোধ কিংবা পেশাদারসুলভ ব্যবহারের নূন্যতম মানের নীচে একেবারে তলানিতে ঠেকে যাওয়া একটা খ্যাতি ও ক্ষমতার দম্ভ এবং ঔদ্ধত্যের অসুস্থ মানসিকতার নামান্তর ছিল মাত্র। ক্রীড়াজগতে খ্যাতনামা এই সাংবাদিক বোরিয়া মজুমদার তড়িঘড়ি "ড্যামেজ কন্ট্রোলে" নামতে গিয়ে "ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি"-র মতোই নিজেকে ধরা দিয়ে জনসম্মুখে আসলেন। কিন্তু ওনার অতি চালাকি করা নয় মিনিটের ভিডিও "ফন্দি" সোশ্যাল মিডিয়ার ময়দানে কিছুতেই ধোপে টিকলো না।

আমরা ক্রিকেটের রঙ্গমঞ্চে আর আর কি কি দেখতে পাব – তার জন্য এখন শুধু সময়েরই অপেক্ষা... কিন্তু আমি চাই আপনাদের সঙ্গে অন্য কোনো খেলা নিয়ে অন্য কোনো রকমের প্রসঙ্গে কথা বলতে, গল্প শোনাতে। ■

আপাতকালীন সঙ্কট মোচন

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

বিশ্বের পরিবেশ দূষণের ব্যাপার নিয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেন, পৃথিবীর কার্বন ফুটপ্রিন্ট (carbon footprint) কম করার জন্য যাঁরা সর্বদাই সচেষ্ট, সেই সব সচেতন মানুষদের জন্য রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধ যে কতটা ভয়াবহ এবং বেদনাদায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে এই যুদ্ধের ফল-স্বরূপ, পরিবেশ দূষণের একটি ছোট্ট উক্তিই তুলে ধরার চেষ্টা করব। সাথে সাথে কিছু পদক্ষেপের কথাও বলব, যা কিছুটা হলেও আমাদের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে।

গত বছর গ্লাসগোতে আয়োজিত ইউ. এন. ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্সে (COP 26 বা জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে) প্রায় ২০০ টি দেশের সম্মতিতে যে ২২,২৭৪ টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তার সমস্ত সুফলকেই ধূলিসাৎ করে দিতে চলেছে।

জাতিসংঘের (UN) সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে – বৈশ্বিক তাপমাত্রাকে প্রাক-শিল্প স্তরের উপরে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমিত করার লক্ষ্য, যা গত বছর জাতিসংঘ

জলবায়ু সম্মেলনে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা এখন বিপাকে, কারণ অকস্মাৎ এই যুদ্ধ এবং বিশ্ববাণিজ্য অঙ্গন থেকে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস – সমস্ত বিশ্বেই এক অনিশ্চিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য যে বিশ্বের অনেক দেশই রাশিয়ার সরবরাহ করা প্রাকৃতিক তৈল ও গ্যাসের ওপর সরাসরি বা অন্যভাবে নির্ভর করে। তাই এখন এই সমস্ত দেশকেই অধিক মূল্যে এই জ্বালানিগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

এ হেন পরিস্থিতিতে, এমন কোন প্রযুক্তিই আমাদের হাতে নেই যা রাতারাতি আমাদের এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারে। কারণ নন-ফসিল (non-fossil) জ্বালানির প্রয়োগ এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। আর আমরা যদি ক্রমবর্ধমান খনিজ তৈল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসাবে যা খুশী তাই জ্বালাতে শুরু করি – তাতে কার্বন ফুটপ্রিন্টের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত এবং অকল্পনীয় ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এই সমস্যার কথা ভেবেই ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (IEA) সম্প্রতি একটি ১০ দফা কর্মসূচীর প্রস্তাব রেখেছে, যাতে করে এই বর্ধমান মূল্যের চাপ হ্রাস করার সাথে সাথে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর প্রয়াসও সম্ভবপর হবে। পরবর্তি অণুচ্ছেদগুলিতে আই. ই. এ.-র ঐ ১০ দফা কর্মসূচীর কথাই বলব...

১) হাইওয়েতে গতির সীমা কমপক্ষে ১০ কি.মি./ঘন্টা কমিয়ে দিন। এতে গাড়ি থেকে প্রায় ২৯০ kb/d তেল ব্যবহার এবং ট্রাক থেকে অতিরিক্ত ১৪০ kb/d সাশ্রয় হবে।

২) **যেখানে সম্ভব সপ্তাহে তিন দিন পর্যন্ত বাড়ি থেকে কাজ করুন**। সপ্তাহে একদিন প্রায় ১৭০ kb/d সাশ্রয় হয়; তিন দিন প্রায় ৫০০ kb/d সাশ্রয় হবে।

৩) **শহরে গাড়ি-মুক্ত রবিবার**। প্রতি রবিবার প্রায় ৩৮০ kb/d সাশ্রয় করে; মাসে একটি রবিবার ৯৫ kb/d সাশ্রয় করবে।

৪) **পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ব্যবহার সস্তা করুন এবং মাইক্রোমোবিলিটি, হাঁটা এবং সাইকেল চালানোকে উৎসাহিত করুন**। এতে প্রায় ৩৩০ kb/d সংরক্ষণ হবে।

৫) **বড় শহরগুলির রাস্তাগুলিতে বিকল্প ব্যক্তিগত গাড়ির অ্যাক্সেস চালু করুন**। এতে প্রায় ২১০ kb/d সংরক্ষণ হবে।

৬) **গাড়ি ভাগাভাগি বাড়ান এবং জ্বালানি ব্যবহার কমাতে অভ্যাস গ্রহণ করুন**। এতে প্রায় ৪৭০ kb/d সংরক্ষণ হবে।

৭) **মালবাহী ট্রাক এবং পণ্য সরবরাহের জন্য দক্ষ ড্রাইভিং প্রচার করুন**। এতে প্রায় ৩২০ kb/d সংরক্ষণ হবে।

৮) **যেখানে সম্ভব প্লেনের পরিবর্তে উচ্চ-গতির এবং রাতের ট্রেন ব্যবহার করুন**। এতে প্রায় ৪০ kb/d সংরক্ষণ হবে।

৯) **যেখানে বিকল্প আছে সেখানে ব্যবসায়িক বিমান ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন**। এতে প্রায় ২৬০ kb/d সংরক্ষণ হবে।

১০) **বৈদ্যুতিক এবং আরও দক্ষ যানবাহন গ্রহণকে শক্তিশালী করুন**। এতে প্রায় ১০০ kb/d সংরক্ষণ হবে।

- kb/d = দিনে হাজার ব্যারেল তেল।

ভ্লাদিমির পুতিন গোটা বিশ্বকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে চাইলেও, আমাদের তো নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করতেই হবে । ঠিক কি না? ■

নতুন বই
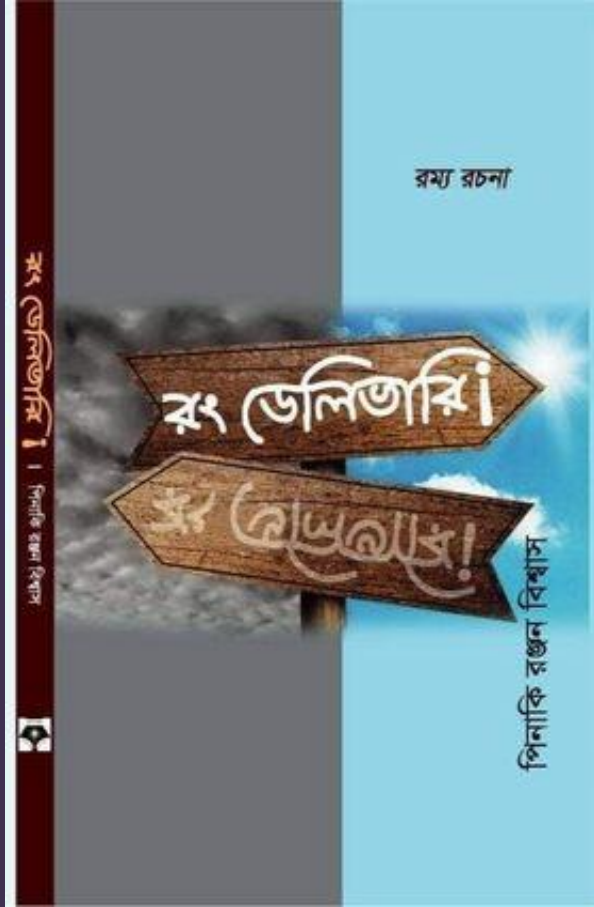
প্রতি পাতায় ভরা হাসি

যা কখনও হয়না বাসী...

সুসাহিত্যিক পিনাকি রঞ্জন বিশ্বাসের একটি অপূর্ব

রম্য রচনার সমাহার...

প্রাপ্তিস্থলঃ

https://www.rokomari.com/book/202818/rong-delivery
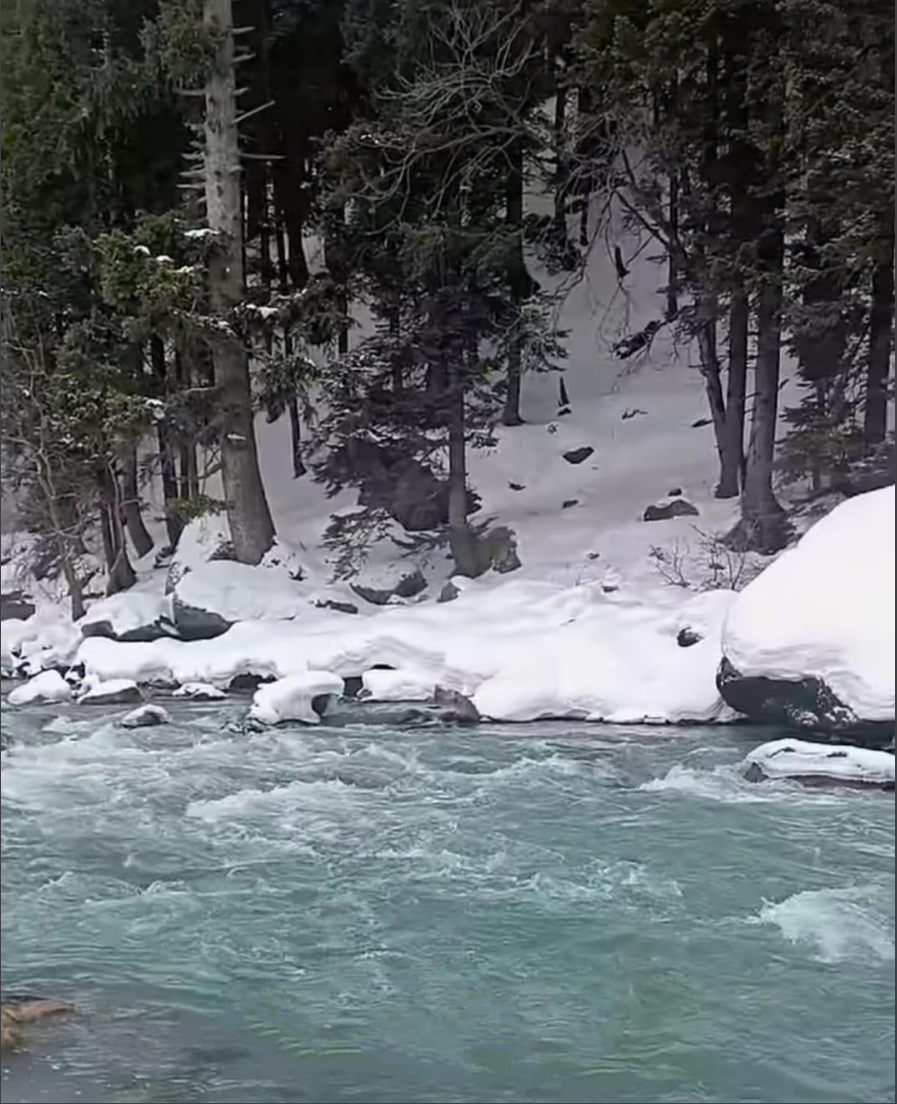
ভারতে শীঘ্রই আসছে...

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ **বিয়াস নদীর কূলে...**

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ **শুভাশীষ মুখার্জী**

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

নতুন বই

প্রখ্যাত সাহিত্যিক নাহার আলমের রচিত গল্প সমূহের একটি অনবদ্য সঙ্কলন...

প্রাপ্তিস্থলঃ বুনন প্রকাশন, সিলেট, বাংলাদেশ
https://www.rokomari.com
ভারতে শীঘ্রই আসছে...

নূর

(৪র্থ পর্ব)

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

চাকরি পেয়ে প্রথম দু'একমাস দীপু হোটেলে ছিল। তারপর ঢাকা শহরে সুন্দর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বাবা মাকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। মা খেয়াল করেন দীপু এখন অফিস থেকে ফিরে তার ল্যাপটপ নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কি সব কাজ করে, তারপর কখন শোয় মা জানতেও পারেন না। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠেই স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করে অফিসে বেরিয়ে যায়। বাড়িতে কারো সাথেই খুব একটা কথা বলে না। যতটুকু যা সময় পায় অফিসের কলিগদের সাথে মোবাইলে কথা বলে। মা শুনে বুঝতে পারেন সবই যেন অফিস সংক্রান্ত কথাবার্তা। মা বাবা কিছু বললে উত্তর দেয়, যেটা অপ্রয়োজনীয় মনে হয় তা এড়িয়ে যায়।

অফিস থেকে দীপু আজ একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরেছে, হাতে মিষ্টির প্যাকেট আর বাবা মায়ের জন্য কিছু উপহার। মা জানতে চান কারণটা। দীপু বলে সে অফিসে "স্টার অফ দি ইয়ার" হয়েছে। বহুদিন পরে ওরা তিনজন এক সাথে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে খেয়ে শুয়ে পড়ে।

অনুরাগ

সকালে উঠেই আবার অফিস ছোটা। এই এক বছরে দীপু যেমন অনেক বেশি গম্ভীর হয়েছে তেমনিই তার চেহারা অনেকটা ভারী হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় কোন বড় অফিসের একজিকিউটিভ সে। অফিস চলে যাওয়ার পর মা বাবা ছেলের জন্য একটা পাত্রী খুঁজলে কেমন হয় তা নিয়ে আলোচনায় বসেন। তাদের সব সময়ই মনে হয় দীপু এই একটা ব্যাপারে মনের দিক থেকে যেন অনেক বেশি দূরে সরে গেছে। সাহস করে যে ছেলেকে বলবেন সেই সাহসটাই তাঁরা সঞ্চয় করতে পারছেন না। গত এক বছরে কোন ছুটির দিনে ছেলেকে তাঁরা কাছে পাননি। সারাদিন ফোন আর ল্যাপটপ নিয়ে ছেলে ব্যস্ত থাকে। কোনো কোনো ছুটির দিনে বিকালের দিকে বাড়ি থেকে বের হয়, ফেরে রাত করে। তার এই গম্ভীর হাবভাব দেখে মা কিছু জিজ্ঞাসা করতেও যেন ভয় পান। ভাবতে থাকেন তবে কি সময়ে ছেলের মনের ব্যথা তিনি বুঝতে পারেননি, অসময়ে দেননি কোন অভয়ও?

চাকরির দেড় বছর পার হয়ে গেছে দীপু একটা গাড়ি কিনেছে। মা-বাবা এখন বেশ গর্বিত। তাঁদের ছেলে গাড়ি কিনবে বা তাঁদের নিজস্ব একটা গাড়ি হবে এতদিন এটা ছিলো শুধুই এক স্বপ্ন। দীপু এখন মাঝে মধ্যে মা-বাবাকে নিয়ে ছুটির দিনে এদিকে সেদিকে একটু বেড়াতে বের হয়। মাঝে মধ্যে অফিসের সহকর্মীরাও তাদের গাড়ি নিয়ে

বাড়িতে আসে। মা খেয়াল করেন – তারা গল্প গুজব করে কিন্তু সবাই কেমন যেন সিরিয়াস। এদের হাসি মায়ের কাছে কেমন যেন কৃত্রিম মনে হয়। এদেরকে যে ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলবেন সে সাহসও হয় না।

একটা বছর পার হয়ে গেছে। নূর কোনদিন তার বাপের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি, এমন কি আব্বু আম্মুর কোন কথা কোনদিনই মুখেও আনেনি। আব্বুর হাতে মার খাওয়ার পর থেকেই তাদের ওপর বড় অভিমান তার। তারা ফোন করে কথা বলতে চাইলে এড়িয়ে গেছে। তার মনের মধ্যে এক প্রশ্ন সব সময় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, সেকি এতটাই বোঝা হয়ে উঠেছিল তার আম্মু আব্বুর কাছে? সে কি কোনদিন কোন দুর্ব্যবহার করেছিল তাদের সাথে? তারা কেন এত তাড়াহুড়ো করে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন? সে তো কোনদিন আম্মু আব্বুর মুখের ওপর কোন কথাই বলেনি। ইদানিং শ্বশুর বাড়িতে তার ওপর অত্যাচার আরো বেড়েছে। শ্বশুর বাড়ির সবারই এখন তার চুলের ওপর অগাধ আস্থা । কথায় কথায় চুলের মুঠি ধরে বাক্যবানে তাকে অস্থির করে তোলে। রোজ চুল আঁচড়াতে গিয়ে গোছা গোছা চুল ওঠে, নূর চুলগুলো এক প্লাস্টিকের ব্যাগে জমিয়ে রাখে, ভাবে দীপুর কথা। পদ্মার পারে সে যখন খোলা চুলে আসতো আর পদ্মার হাওয়ায় তার মুখে চুল উড়ে পড়তো দীপু বলতো, "তোর মুখটা যেমন সুন্দর

তেমনই তোর চুলগুলোও, তুই চুল খোলা রাখ তাতে আমার দুঃখ নেই কিন্তু আমার সামনে তোর চুল তোর মুখ ঢেকে তার গরিমা প্রকাশ করবে এটা মানা যায় না।" নূর এক অহংকারের হাসি দিয়ে মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে নিত। এই এক বছরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকেই যেন চিনতে পারে না। সে জেনেছে তার স্বামী কোন বড় মিলিটারি অফিসার নয়। সামান্য এক হাবিলদার। গত এক বছরে সংসারে একটা টাকাও পাঠায়নি, স্ত্রীর হাত খরচের টাকা তো অনেক দূর অস্ত। মধ্যেও দু'বার বাড়ি এসেছিল কিন্তু নূরের হাতে কোন টাকা দিয়ে যায়নি। প্রথম বার অবশ্য নূর টাকা চেয়েছিল, বিদ্রূপ করে বলেছিল টাকা নিয়ে কি করবে, লিপিস্টিক মেখে দরজায় দাঁড়াবে? লজ্জায় ঘৃনায় নূর আর কোনদিন স্বামীকে কখনও টাকার কথা বলে নি। স্বামী ফিরে গেছে তার কর্মস্থলে। বাড়িতে ননদ কোন কিছু খুঁজে না পেলে তাকে বাক্যবানে জর্জরিত করে তোলে। সঙ্গে শাশুড়ীমাও সমান তালে তাল দিয়ে চলেন। আগে শুধু মুখ চলতো এখন মুখ ব্যথা হয়ে গেছে তাই হাতও চলে। শ্বশুর মশাইও কম যান না, তিনি আরো এক ধাপ উপরের লোক। পাড়াময় নূরের সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়ে এক জনমত খাড়া করানোর চেষ্টায় ব্রতী। তিনি নিজ মুখে নূরকে কিছু বলেন না, মেয়ে আর স্ত্রীকে দিয়ে বৌমাকে শাসন করান।

দেখতে দেখতে প্রায় দুটো বছর হতে চলেছে। স্বামী

এখন ছুটিতে বাড়িতে আসে কিন্তু অনেকদিন ধরে বাড়িতে থাকে। এখন সে আরো বেশি মাদকাসক্ত হয়ে উঠেছে। নূর এখন অন্তঃসত্ত্বা, সে চিন্তিত হয়ে পরে যে আসছে তার ভবিষৎ ভেবে। এখন তার খুব খিদে পায় কিন্তু বাড়িতে খাবার চাইতে পারে না। খাবার চাইতে গেলে অশ্লীল কথা শুনতে হয়। নিজের ঘরে কিছু কিনে এনে রাখবে সে সামর্থটুকুও নেই। সে খেয়াল করে প্রথম রাত্রে তার দেওয়া হীরের আংটিটা স্বামীর আঙ্গুলে নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলে হারিয়ে গেছে। কবে জানতে চাইলে অশ্রাব্য গালাগালি দেয়, বলে বাড়ির কাজের লোকের এত আগ্রহ কেন? নূর কথা বাড়ায় না। স্বামী কর্মস্থলে ফিরে যায়। আট ন'মাস পরে আবার বাড়ি ফিরে আসে। একদিন গাড়িটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়, দুদিন পরে বাসে করে বাড়ি ফেরে। নূর জানতে চাইলে বলে খারাপ হয়ে গেছে গ্যারেজে দিয়ে এসেছে। নূরের চেহারা আরো কঙ্কালসার হয়েছে। শরীরে অপুষ্টির ছাপ স্পষ্ট। কিছুদিনের মধ্যেই তার প্রসব বেদনা ওঠে। স্বামী একটা রিক্সা ডেকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফেলে দিয়ে আসে। যথা সময়ে সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এক সকালে শাশুড়ী মা তাকে বাড়ি নিয়ে আসেন। ছেলে হওয়াতেও বাড়িতে যে খুব একটা আনন্দ সেটা দেখা যায় না। মাস ছয়েক পর সে জানতে পারে স্বামী চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, শুধু তাই নয় নূরের বাবার দেওয়া

গাড়িটাও বিক্রি করে দিয়েছে। এখন স্বামী সবসময়ই বাড়িতে থাকে, মদ্যপান এবং অত্যাচার দুটোই বেড়েছে। দিনকে দিন অত্যাচারের মাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠছে। প্রায়ই বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য তার ওপর চাপ দেয়। একদিন সে মুখের ওপর বলে দেয় পারব না। স্বামী তার পুত্রটিকে রেখে বাড়ির সবার সামনে তাকে তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। মনের দুঃখ বেদনা ভুলে কোন রকমে নিজের হাতের আংটিটা বিক্রি করে সে রাজশাহী ফিরে আসে। স্টেশনের বাইরে বসে ভাবে সে কি বাড়ি ফিরে যাবে নাকি দীপুর বাড়িতে গিয়ে একবার তার সব বেদনা খুলে বলবে। দীপু কি এখন বাড়িতে? খুব ক্ষিদে পেয়েছে। স্টেশনের সামনে এক কচুরীর দোকান দেখে ঢুকে পরে। কচুরী খেতে খেতে লক্ষ্য করে দোকানদার তাকে বার বার দেখে যাচ্ছে, একসময় উঠে এসে জিজ্ঞেস করে, “তুই নূর না?” নূর “হ্যাঁ” বলে কিন্তু চিনতে পারে না। ছেলেটি বলে, “কি চেহারা হয়েছে তোর! চিনতে পারলি না তো? মনে করে দেখ কলেজ লাইফে তোর পেছনে সব থেকে বেশি কে লাগতো।” নূরের মনে পরে সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে একটা ছেলে ওর পেছনে ঘুর ঘুর করতো আর ওকে দেখলেই সোডার বোতলের মতো ওর মুখ দিয়ে কবিতা বেরিয়ে আসতো। পড়াশোনা করতো না। কি যেন নামটা! ঠিক মনে করতে পারে না। ছেলেটি বলে “আমি

নঈম।” নূরের মনে পরে যায় পুরনো দিনের কথা।

নঈম তাকে যত্ন করে খাওয়ায়। অনেকদিন পরে নূর যেন খুব তৃপ্তির সাথে কচুরীগুলো খেলো। খাওয়ার পর এক কাপ চা দিয়ে বলল চা খেয়ে বস আমি একটু গুছিয়ে নিই। নঈম দোকানের কর্মচারীদের কিছু কাজ বুঝিয়ে নূরকে এক রকম জোর করে নিজের মোটরসাইকেলের পেছনে তোলে। নূর জানতে চায় তাকে কোথায় সে নিয়ে যাচ্ছে? নঈম বলে “বাসায়” যাওয়ার পথে নূরের এদশা কেন জেনে নেয়। স্ত্রীকে ডেকে বলে ও আমার বোন, ওকে দেখো। নূরকে নামিয়ে সে আবার ফিরে যায় তার দোকানে। রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরে। নূরের হাতে একটা বড় প্যাকেট তুলে দেয়। নূর জানতে চায় কি আছে এর ভেতর? নঈম বলে খুলে দেখিস আর কিছু প্রয়োজন হলে বলিস। নূর খুলে দেখে নঈম তার জন্য জামা কাপড় কিছু রূপচর্চার জিনিস সব কিনে এনেছে। নূরের চোখ জল। নঈমের স্ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে বলে আজ থেকে তুমি আমারও বোন। নঈম ও তার স্ত্রীর আদর আপ্যায়নে নূর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবে একদিন সে নঈমকে কি ভুলটাই না বুঝে ছিল। এত আদর আপ্যায়নের মধ্যেও তার মন নীরবে সন্তানের জন্য কেঁদে ওঠে। নঈমের স্ত্রী তাকে বোঝায় তুমি সন্তানের জন্য এখন কেঁদো না – বরং মনে জোর আনো যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ওদের মুখের ওপর

যোগ্য জবাব দেবে। দেখবে সেদিন তোমার সন্তান ঠিক তোমার কাছে ফিরে আসবে। কথাগুলো শুনে নূরের মনে যেন এক বিশাল পাথর সরে গেল। সে দেখতে পেল সামনে খোলা আকাশ। কিছুদিন পরে এক রাতে নঈম বাসায় ফিরলে নূর তাকে বলে, “আমি আবার পড়তে চাই।” নঈম দুহাত তুলে নেচে ওঠে, “আমি এটাই চেয়েছিলাম, আর তোর মুখ থেকেই কথাটা শুনবো বলে অপেক্ষায় ছিলাম।” কালকেই আমি ব্যবস্থা করছি।

...ক্রমশ ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে

নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

নতুন বই
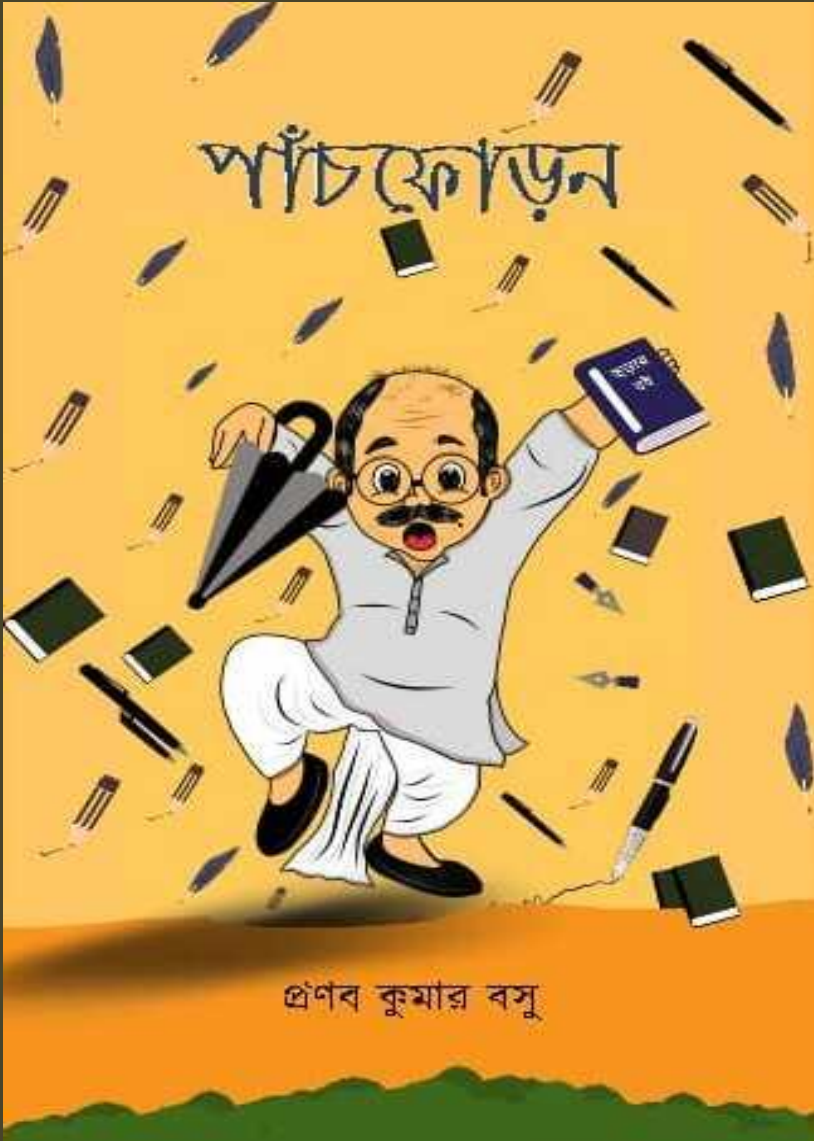
হাসির মহারাজা প্রণব কুমার বসুর রচনা সমূহের একটি একত্রিত সঙ্কলন...

প্রাপ্তিস্থলঃ

রক্তকরবী, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা

পুষ্প দিয়ে শেষ কাজ

রানা জামান (বাংলাদেশ)

বাংলা ভাষা নাচে জিভে ছন্দ তুলে নিত্য নিবে
ভোর বেলা ডাকে পাখি
নদী চলে এঁকেবেঁকে ঢেউ ছাড়ে থেকে থেকে
মন দিয়ে চিত্র আঁকি।

মা'র ডাকে নিজ ভাষা পুড়ে দেয় মনে আশা
আহা! তৃপ্তি পাচ্ছি কী যে,
শব্দ দেখে ভুল বর্ণে রক্ত জমে দুটো কর্ণে
ক্ষোভে চক্ষু আসে ভিজে।

বর্ষ গিয়ে আসে ফের লেখালেখি হচ্ছে ঢের
ভিন্ন ভাষা চাপছে তত
রক্ত লাগা বর্ণগুলো লাগছে গায়ে ম্যালা ধুলো
সাথে বাড়ছে গায়ে ক্ষত।

পর্বে আছি মজে আজ পুষ্প দিয়ে শেষ কাজ
মূল কাজে বেশ হেলা
বাংলা তুমি খাতাপত্রে শুদ্ধ আছো প্রতি ছত্রে
মুখে চলে ভিন্ন খেলা। ■

পড়ুন, ডাউনলোড ও শেয়ার করুন

আমাদের প্রকাশিত (নিঃশুল্ক) ই-বুক

উপাখ্যান আখ্যান মহাখ্যান

URL: http://online.fliphtml5.com/osgiu/ozzm/

অক্ষরাঞ্জলি

URL: https://online.fliphtml5.com/osgiu/csjb/

বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষী

URL: https://online.fliphtml5.com/osgiu/optm/

প্ল্যাটফর্ম

অন্তিম পর্ব

দেবী প্রসাদ চৌধুরী

একসময় আলো এসেছিল। একটি মোমবাতি দিয়ে গিয়েছিল হোটেলের বেয়ারা। ট্রেনের ঐ কামরার মধ্যেই অর্ডার মতো ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম আমরা। তারপর ইঞ্জিন লেগেছিল, আলো জ্বলেছিল, ফ্যান ঘুরে ছিল। দু'টি ট্রেনের যাত্রীতে বোঝাই হয়েছিল কামরা। আমি ওপরের 'বাঙ্ক'-এ ঘুমোতে চেয়েছিলাম, সুপর্ণা দেয়নি ওর ভয় করছিল। ওর পাশে অপরিচিত যাত্রী বসবে, এটা সম্ভবত ও মেনে নিতে পারেনি। তাই ওর পাশেই বসতে হোল, ও খুব খুশি হলো। আমরা একে অপরের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হলাম। ওপরে কিশোর ভাইটি ঘুমোচ্ছিল। নীচে আমরা গল্প করছিলাম। ট্রেন ছুটছিল। রাতের হিমেল হাওয়ায় চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। ওর পাশে বসে আমার মনের মধ্যে প্রচণ্ড এক আলোড়ন চলছিল। ওর পাশে কি আমি চিরকাল থাকতে পারিনা? কিংবা ও আমাকে এতটা বিশ্বাস করল কেন? তবে কি এটুকু সময়ের মধ্যে সুপর্ণা আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে! আমাকে ছাড়া কি তার চলবে না?... মনের মধ্যে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা আমাকে বারবার মোহান্ধ করে দিচ্ছিল।

ট্রেনের দুলুনিতে আমরা পরস্পরের গায়ে ঢোলে পড়ছিলাম। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন ভোররাত্রি। দেখলাম, ওর মাথা আমার ঘাড়ে। আমাদের সিটের আশেপাশে আরও নতুন নতুন যাত্রী গড়াগড়ি দিচ্ছে সব চতুরদিকে। রীতিমতো চাপাচাপিতে বসতে হয়েছিল।

...মনে পড়ে, ট্রেন জার্নিতে সুপর্ণা আমাকে গাইড করে এই শহরে পৌঁছে ছিল। তখন আমরা পরস্পরের নামধাম পরিচয় সব জেনে গেছি। ষ্টেশনে নেমে দু'টো রিক্সা নিয়ে ছিলাম। এরপর দুটো রিক্সা ক্রমশ দূরত্বের ব্যবধান বাড়িয়ে, এক সময় হারিয়ে গিয়েছিল। আজ আর সব কথা স্পষ্ট মনেও নেই। তবে সুপর্ণার আন্তরিকতা এবং আমার ওপর তার গভীর বিশ্বাস ভুলে যাব কি করে? চেহারাটা ভুলে গেলেও ঘটনাটি দিব্যি মনে আছে...

সেই সুপর্ণা আজ আবার ট্রেনে উঠবে। দশ বছর পর দেখা। অস্বাভাবিক ঘটনা। কামরূপ এক্সপ্রেসের আলোটা দেখতে পেয়ে আমি বললাম, 'আপনাদের ট্রেন আসছে।' সুপর্ণা বলল, 'সেবার বলেছিলেন আমাদের কোয়ার্টারে যাবেন, যাননি কেন?' আমি বললাম, 'বোধহয় কিভাবে যাবো ভাবতে পারিনি, কিংবা ট্রেনযাত্রীনিকে শুধু যাত্রীনি হিসাবেই দেখেছিলাম কিনা মনে নেই।' সুপর্ণা আঘাত পেল। আস্তে করে বলল, 'ভুল করেছেন। জানেন, আমরা একমাস পরেই এখান থেকে বদলি হয়ে পাণ্ডুতে চলে গিয়েছিলাম।'

ভুল, কিসের ভুল? সুপর্ণা কি বলতে চাইছে? তবে কি সুপর্ণা শুধু ট্রেন যাত্রীনী হয়ে থাকতে পারেনি? আমার মনটা কেমন হয়ে যাচ্ছে।

ওর প্রতি এক গভীর একাত্মবোধ-এ আত্মহারা হয়ে পড়েছি। সম্ভবত এখনো 'ব্যাচেলর' বলেই মনের মধ্যে আমার ভালবাসার আবেগ ছড়াচ্ছে।

বেঞ্চি ছেড়ে উঠলাম। ওরা মালপত্র হাতে নিল। আমি ওদের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। ট্রেন ঢুকল প্ল্যাটফর্ম-এ, আস্তে আস্তে থামল। আমি চোখ রাখলাম ট্রেনের কামরায়। আমার 'রিলেটিভ'-এর মুখ খুঁজলাম, পাচ্ছিনা। হঠাৎ সামনের 'থ্রী-টিয়ার বগি' থেকে সুপর্ণার কণ্ঠস্বরে আমার ভাবনার তন্ত্রী ছিঁড়ে গেল। 'একটু এদিকে আসবেন?' আমি দেখলাম খোলা জানালার পাশে মুখ রেখে ও আমাকে ডাকছে। আমি কাছে গেলাম। জানালার শিক ধরে দাঁড়ালাম। ভেতরে চোখ বুলোতে দেখলাম, ওর মামা জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছেন। কিছু ভাবার পূর্বেই সুপর্ণা বললো, 'চলুন না, উঠে আসুন। আবার আমরা যাই।' ওর মুখে দুষ্টু হাসি। আমি বললাম, 'এখন আর অসুবিধে কি? সেই জেলে-ডিঙ্গিও নেই, আর সেই অন্ধকারও নেই।'

ও হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। বড্ড বিষণ্ণ। চোখদু'টি খুব করুণ দেখাচ্ছে। এখনই একটা কান্ড ঘটবে। ও আমার হাতের আঙুলগুলো আলতোভাবে ধরে বলল, "আমার

ভেতরের অন্ধকারটা যে চিরন্তন, আনন্দ।’ ট্রেনটা আর্তনাদ করে উঠলো। ছেড়ে যাবে। আমি নিজের ভেতরে একটা কাঁপুনি অনুভব করলাম। হঠাৎ মনটা সুপর্ণার জন্য বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। দশ বছরের হারানো মুখটি আমার ভিতরের সংযমের বাঁধটা গুঁড়ো করে দিলো। ওর নরম হাতটাতে একটু চাপ দিয়ে এক নিঃশ্বাসে বললাম, ‘আমার বড্ড যেতে ইচ্ছে হচ্ছে পর্ণা, খুব ইচ্ছে করছে। কিছুই যে বলা হলো না।’

ট্রেনটা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে, জানলায় হাত রেখে আমি এগিয়ে যাচ্ছি ট্রেনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ও দ্রুত কাঁপা কাঁপা কন্ঠে বলল, ‘সেবার জেলে-ডিঙ্গীতে যেভাবে একটি মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে এত বড় নদীটা পার করে দিয়েছিলে আনন্দ, ওভাবে চিরদিনের দায়িত্ব নিতে পারবে না? এ মাসের একত্রিশে আসছি।’

হাত ছেড়ে দিতে হলো। ট্রেনের গতি বাড়ছে। আমি দ্রুত আরেকটু পথ এগিয়ে যাচ্ছি। সুপর্ণা আবার বললো, ‘দশ বছরের স্মৃতি আমি এখনো ধরে রেখেছি আনন্দ। এবার তোমাকে খুঁজে বার করবোই।’ দেখলাম ওর চোখে মুখে একটা তৃপ্তির সুখ জেগে উঠেছে। আমি হাত তুললাম। জানলা থেকে ও ওর ফর্সা হাত নড়ছে। দূরে, ক্রমশ দূরে। অন্ধকারে একসময় ট্রেনের পিছনের লাল আলোটা আর দেখা গেল না... ■

বই, আমার বই

শর্মিলা ভট্টাচার্য

ছোট্ট মানুষ, ছোট্ট জীবন, ছোট্ট পরিধি,
সারা জীবন চলার পথে অনেক নিষেধ বিধি।
ঝগড়া ঝাঁটি, মারামারি, কত যে হানাহানি!
তার মধ্যেও সাহস যোগায় বইএর পাতাখানি।।

প্রথম যেদিন বর্ণ ছুঁলাম, ছুঁলাম নিজের সত্ত্বা,
সেই থেকে মোর সঙ্গী হলো বই খাতার দিস্তা।
স্কুলের পরে কলেজ গেল, এখন জীবন সায়াহ্নে,
বইগুলোকেই আঁকড়ে ধরি একটু বাঁচার জন্যে।।

কাছের মানুষ, দূরের মানুষ সবাই ছেড়ে চললো,
বইগুলো সেই একইভাবে একই স্থানে রইলো।
সুখে দুখে, ওরা বলে – আমরা কাছে আছি,
তাইতো আমি আজকে শুধু ওদেরই কাছাকাছি।।

আমার দুঃখে ওরা কাঁদে, আমার সুখে হাসে,
আমি বুঝি, ওরাই আমায় সত্যি ভালবাসে।
বলতে থাকে কানে কানে, ভয় পেওনা প্রিয়ে,
শেষ অব্দি থাকবো কাছে সব দুঃখ নিয়ে।।

তোমার ছোঁয়ায় পেয়েছি জীবন, তুমিই মহৎ বন্ধু,
সুখ দুঃখেই পার করব জীবন-মরণ সিন্ধু।। ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ **সায়াহ্নের সমুদ্র তট...**

শিল্পীঃ **সোহম মন্ডল ✧ বয়সঃ ১৮ বছর**

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান চিত্রগ্রাহকের ছবিটি কেমন লাগল...

দাগ

রঞ্জিত মল্লিক (বাংলাদেশে)
(কবিরুল)

কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা ফলের দোকানে এল রিনি। সে কিছু ফল কিনবে ঠাকুরের জন্য পছন্দমতো। ফল কিনে সে স্কুটির পাশে আসতেই একটা বাচ্চা মেয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল। গায়ের রঙ কালো, রুগ্ন চেহারা, মাথায় রুক্ষ চুল, পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়। সে রিনিকে বলল, "পাঁচটা টাকা দাও না গো দিদি! কাল থেকে কিছু খাইনি।"

রিনি ব্যাগ থেকে পাঁচটা টাকা বের করে মেয়েটির হাতে দিতেই, মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নিল। আর সেই সময় রিনি লক্ষ্য করল মেয়েটির রুগ্ন হাতে ঝলমল করছে উল্কিতে লেখা নাম "রাani" মানে "রাণী"। রিনির "র", অনিকেতের "ani।" বাংলা, ইংলিশ দুই অক্ষর মিলে মিশে তৈরী হয়েছিল।

নামটা দেখেই রিনির বুকটা ধরাস করে উঠল। মেয়েটিকে আর দেখা যায়নি। টাকা নিয়েই চলে গেছে। মেয়েটি ওর বিশেষ পরিচিত বলেই মনে হল। হাতের উল্কি সেটাই প্রমাণ করে। চোখ দুটো যেন কত কালের চেনা।

বন্ধন

বাড়িতে এসেই অনিকেতকে ফোনে ধরল রিনি। ও অফিসের কাজে ব্যস্ত। ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। মিটিং চলছে। সপ্তাহ শেষ হতে এখনও দু-তিন দিন বাকি। অনিকেত উইক এণ্ডে একবার করে আসে। তবে কাজের গতি বুঝে। অনেক সময় শনি, রবিবার অফিস করতে হয়।

মেয়েটির চিন্তায় সারা রাত ঘুম হয়নি ওর। কোন কিছু ভাল লাগছে না। রিনি রাতে কিছু খাবে না ঠিক করেছে। শাশুড়ির গলা শুনল," বৌমা, শরীর খারাপ না কি?"

"হ্যাঁ মা, আজ শরীরটা ভাল নেই।"

"কেন কি হয়েছে? ডাক্তার ডাকব?"

"না, তেমন কিছু নয়। একটু ঘুমালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শাশুড়ি-মার মুখে ডাক্তারের কথা শুনে রিনির আর এক ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল। রাতে ঘুম আসছে না ঠিকমত। কিন্তু সে ডাক্তারের ঠিকানাটাও নেই। তবে ওনার নার্সিং হোমে গেলে ওনার খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই, শাশুড়িমাকে এক অজুহাত দেখিয়ে রিনি বেরিয়ে পড়ল ডাক্তারের খোঁজে। তিনদিন কেটে গেছে। রিনি বুধবার সকালে ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়ে তারপর ঘরে এসে, দুপুরে আর একবার বেরিয়ে সেই যে গেল – আর ফেরেনি। অনিকেত এই সপ্তাহে বাড়ি আসেনি। কাজের চাপ। শাশুড়ি-মাও বেশ চিন্তিত। তবে পুলিশে ডায়েরী করার কথাটা মাথায় আসেনি। এর আগেও একবার

সে এই রকম করেছিল। সেবার চারদিন পরে ফিরেছিল। তখন অনিকেতের সাথে মনোমালিন্য ছিল।

চারদিন পরে রিনি ফিরল। তার সাথে পুলিশের এক বড় অফিসার আছেন। আর কিছু ফোর্স সিভিল ড্রেসে। অনিকেত সব শুনে দু'দিন আগেই অফিস থেকে ফিরে এসেছে। ও বেশ চিন্তিত।

অনিকেত কিছু বলার আগেই পুলিশ অফিসার নিজের পরিচয় দিয়ে অনিকেতকে অ্যারেষ্ট করলেন। শাশুড়িমা সব দেখে প্রায় জ্ঞান হারাবার উপক্রম। পাড়া প্রতিবেশীরাও বেশ ঘাবড়ে গেছে, রিনির এই ধরণের কাণ্ড কারখানা দেখে। কি এমন ঘটল যে বাড়িতে পুলিশ ডাকতে হল।

কেসটা চলতে আটটা বছর লাগল। কেসে অনিকেতের দোষ প্রমাণিত হয়েছে। ও এখন জেলে আছে।

ইতিমধ্যে রাণীও অনেক বড় হয়েছে। ও এখন আর ভিক্ষে করে না। রীতিমত পড়াশোনা করে। রাণীর উল্কির দাগটা হয়ত একদিন প্লাসটিক সার্জারি করে মুছে যেতেও পারে, কিন্তু অনিকেতের অপরাধ সমাজে যে ক্ষত সৃষ্টি করল; সেই দাগ কোনোদিন মুছবে না।

অনিকেত একজন গাইনোকোলজিস্ট। ওর বন্ধুর নার্সিং হোম আছে। সেখানে ও পরিষেবা দিত। ঐ নার্সিং হোমে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে এক চক্র কাজ করত। যদি ফিমেল চাইল্ড হত, জন্মদান করার পর তাদেরকে একটু বড় করে

বিক্রি করে দেওয়া হত এক শ্রেণীর দালালের কাছে। মাঝে মাঝে মেল চাইল্ডকেও বিক্রি করা হত। একটু বড় হবার পর। আর এই সমস্ত চক্রের মূল পাণ্ডা ছিল অনিকেত।

দালালরা ঐ সব বাচ্চাকে দিয়ে ভিক্ষে করাত। আর নানান অবৈধ কাজ করাত। যেমন চুরি, পকেটমারি। ঐ সব দুঃস্থ বাচ্চাদের কিডনিও বিক্রি করা হত। কিডনি চক্রের মূল পাণ্ডার সাথে অনিকেতের যোগাযোগ ছিল। সেখান থেকে ও ভাল কমিশন আদায় করত। বন্ধুর নার্সিং হোমে গোপনে চলত কিডনি সংক্রান্ত অবৈধ কাজ কারবার। পুলিশ প্রশাসনের আড়ালেই চলত এই সমস্ত কারবার। আর অনেক পরিবার ফিমেল চাইল্ড নিতে চাইত না। তাদের কাছে পুত্র সন্তান – মানে পরিবারের বংশ রক্ষাই ছিল শেষ কথা। নার্সিং হোমের সাথে পরিবারের প্রধান কর্তা বা কর্তাদের একটা গোপন যোগাযোগ থাকত। মেয়ে বাচ্চা জন্মানোর সাথে সাথেই পরিবারকে জানানো হলে, পরিবারের প্রধান কর্তা ব্যক্তিরা এটা বলেই পরিবারকে স্বান্ত্বনা দিতেন যে, তাদের বাচ্চা ডেলিভারীর সময় মারা গেছে।

রাণী খুব মিষ্টি একটা বাচ্চা ছিল। যেটা অনিকেতের ভীষণ প্রিয় ছিল। বাচ্চাগুলো একটা আশ্রমে রেখে বড় করা হত। অনিকেত রাণীকে দত্তক নিতে চেয়েছিল। কারণ রিনির মা হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিপদ হতে পারে বুঝে দত্তক নেয়নি। এক ডাক্তার, কেন জানিনা, ওদের দুজনের

নামের আদলে বাচ্চাটার নাম রেখেছিলেন রাণী। তিনি উল্কিও করেছিলেন।

অনিকেত রাণীকে ভীষণ ভালবাসত। মাঝে মাঝে ওর জন্যে খাবার এনে খাওয়াত। জামা কাপড় কিনে দিত। ঐ ডাক্তারই সব জানত। রিনি ধীরে ধীরে সব প্রমাণ জোগার করে ঐ ডাক্তার আর অনিকেতকে ধরিয়ে দেয়। রিনির এই দুঃসাহসিক কাজে ওকে ওর কাকা খুব সাহায্য করেন। কাকা ক্রাইম ব্রাঞ্চের একজন অফিসার ছিলেন।

অনিকেত আর রিনির সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরে অনিকেত অন্য অনেক মেয়ে, নার্সের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। ওরা অনিকেতকে টাকার জন্যে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। তাছাড়া অনিকেতের নিজেরও টাকার প্রতি একটা আলাদা মোহ ছিল। ও রেস আর জুয়োতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। তারপর ধীরে ধীরে ওর অধঃপতন হতে শুরু করে। রাণীর উল্কিটাই জোরাল প্রমাণ হিসেবে কাজ করল।

রাণী এখন রিনির কাছেই থাকে। ক্লাস নাইনে পড়ছে। রাণী রিনিকে "মা" বলে ডাকে। দুটোতে বেশ জমেছে। রাণীকে পেয়ে রিনি পুরানো অতীত ভুলে জীবনটা নতুন করে শুরু করেছে।

মা মেয়ের হাসি ঠাট্টাতে বাড়িটা নতুন করে ঝলমল করে উঠছে। ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ